ব্যাটল ফর পাওয়ার

তেলরাজনীতি ও পরাশক্তির উত্থান-পতন

সোহেল রানা

গার্ডিয়ান
পা ব লি কে শ ন স

সূচিপত্র

প্রথম অংশ	
মহাশক্তির মহাপতন	১৫
সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র	২২
তালেবান পুনরুত্থানের রহস্য	২৬
আফগানিস্তান সাম্রাজ্যবাদীদের গোরস্থান	৩২
হিটলার, হলোকাস্ট, জাতীয়তাবাদ ও ফ্যাসিবাদ	৩৭
বণিকের ছদ্মবেশে পারস্যে ইউরোপের গুপ্তচর	৩৯
ইরানের প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা দেয়াল 'জাগ্রোস'	৪১
তৈমুরের দরবারে বুলবুল-ই সিরাজ	৪৪
গুপ্তচররা ধর্মযাজককে খুঁজে পেয়েছেন	৪৮
পারস্যে তেলখনি আবিষ্কার	৫১
মসলার যুদ্ধ	৫৩
পেট্রোলিয়ামের ভূ-রাজনীতি ও ব্রিটেন	৫৭
ব্রিটেনের অটোমানবিরোধী ষড়যন্ত্র	৬১
আরব-ইজরাইল দহরম-মহরম	৬৩
তেল বাণিজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে জার্মানির পতন	৬৫
মার্কিন তেল বাণিজ্যে রাশিয়ার হানা	৬৮
তেল বাণিজ্যে রথসচাইল্ড পরিবার	৬৯
সেভেন সিস্টার্স-এর হাতে বিশ্ব তেলের বাজার	৭১
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের গতি বদলে দেয় তেল	৭২
ব্রিটেনকে ডিঙিয়ে পরাশক্তি হওয়ার দৌড়ে আমেরিকা	৭৩
রাশিয়ার সমাজতন্ত্রের কৌতুক	৭৬
চীনা সমাজতন্ত্র যেভাবে দুর্ভিক্ষ ডেকে এনেছিল	৮০
বলশেভিক বিপ্লব	৮২
রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র ব্যর্থ হওয়ার কারণ	৮৫

চীন ও সাম্রাজ্যবাদ	৮৯
ভারতবর্ষে ইংরেজদের লুটপাটের ইতিহাস	৯০
আফিম নিয়ে যুদ্ধ	৯৩
চীন, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও মাও সে তুং	৯৬
গ্রেট লিপ ফরোয়ার্ড	১০১
সাদা-কালো ব্যাপার না, বিড়াল ইঁদুর ধরতে পারলেই হলো	১০৬
যেভাবে পরাশক্তি হলো চীন	১১০
ভবিষ্যৎ পৃথিবীকে নেতৃত্ব দেবে কে	১১৫
তেলসমৃদ্ধ দেশগুলোতে সাম্রাজ্যবাদীদের নজর	১২০
প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, জার্মানি ও তার ট্র্যাজেডি	১২৪
তেল ব্যবসায়ীদের গোপন সমঝোতা	১২৬
আমেরিকায় মহামন্দা	১২৭
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতনের সূচনা ও ডলারের উত্থান	১৩০
তেল দখলে ইরানে ইংরেজ হানা	১৩২
ইরানের মোসাদ্দেককে সরানোর চক্রান্ত	১৩৬
সিআইএ-র ব্লু-প্রিন্টে ইরানে ক্ষমতার পালাবদল	১৩৮
ইতালীয় তেল ব্যবসায়ী এনরিকো মাত্তেই-এর হত্যারহস্য	১৪৫
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দুরবস্থা ও নিক্সন শক	১৪৮
তেল অবরোধ সামাল	১৫১
ডলার যেভাবে পেট্রোডলারে রূপ নিল	১৫৩
ইরানের ইসলামি বিপ্লব	১৫৬
ইসলামি বিপ্লবের নেপথ্যে যে বিদেশি গ্রাম	১৫৯
উপসাগরীয় যুদ্ধ : সাদ্দাম হোসেন ও তেল	১৬২
উপসাগরীয় যুদ্ধে আমেরিকার ভূমিকা	১৭১
কুর্দি সংকট	১৭৫
কুর্দি নেতা মুস্তফা বারজানিকে হত্যার চেষ্টা	১৮১
বাথ পার্টি ও সাদ্দামের উত্থান	১৮৪
গোড়াতেই নিষ্ঠুরতা	১৯১
সাদ্দামের গুম-খুনের শাসন	১৯৫

কুর্দি বিদ্রোহ ও হালাবজা ট্র্যাজেডি	১৯৯
ইরাকে আমেরিকার আগ্রাসন কি পূর্বপরিকল্পিত	২০৪
টুইন টাওয়ারে সন্ত্রাসী হামলা	২০৭
আফগানিস্তানে আমেরিকার দীর্ঘ ২০ বছরের লড়াইয়ের সূচনা	২১০
তালেবানের জন্ম ও উত্থান	২১৭
তালেবান উৎখাত কি পূর্বপরিকল্পিত	২২১
খনিজ সম্পদের ভান্ডার আফগানিস্তান	২২৭
আফগানিস্তানে শেষ কমিউনিস্ট শাসকের পরিণতি	২৩১
দ্বিতীয় অংশ	
সৌদি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ইতিহাস	২৪৪
তেল যেভাবে সৌদি আরবের চেহারা পালটে দিলো	২৪৭
আরামকো	২৫২
আরামকো নিয়ে বিবাদ	২৫৬
মুখোমুখি বাদশাহ সউদ ও ভাই ফয়সাল	২৬১
কীভাবে এলো ওপেক	২৬৪
সউদকে ক্ষমতা থেকে সরানোর প্রস্তুতি	২৬৬
সৌদি আরবের নতুন বাদশাহ ফয়সাল	২৬৯
বাদশাহ ফয়সাল হত্যাকাণ্ড	২৭১
কেন খুন হলেন বাদশাহ ফয়সাল	২৭৩
পবিত্র কাবা অবরোধ	২৭৬
কাবার বিদ্রোহীদের পরিণতি	২৭৮
আরামকো সৌদির হলো	২৮২
ওসামা বিন লাদেন	২৮৩
উপসাগরীয় যুদ্ধ ও আরামকোর তেল ব্যাবসা	২৮৫
ভূমধ্যসাগর ও তেল-গ্যাসের লড়াই	২৮৭
কী ছিল লুজান চুক্তিতে	২৯২
সাইপ্রাস নিয়ে দ্বন্দ্ব	২৯৪
ইস্তাম্বুল খাল	২৯৯
সহায়ক গ্রন্থসমূহ	৩০৩

মহাশক্তির মহাপতন

১৬ই আগস্ট, ২০২১। পত্রিকার পাতায় লাল কালির ঢাউস শিরোনাম—‘তালেবানের হাতে কাবুলের পতন...’

কাবুলজুড়ে উড়ছে তালেবানের পতাকা। ২০ বছর ধরে পাহাড়-জঙ্গলে পালিয়ে বেড়ানো সেই পুরোনো যোদ্ধারা এখন কাবুলের হর্তাকর্তা। মাঝখানে অসংখ্য মৃত্যু আর দুঃসহ স্মৃতির বোঝা। ২০০১ সালে আমেরিকার হাতে শুরু হওয়া সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অন্তহীন যুদ্ধের পথে প্রথম বহুজাতিক এনকাউন্টারের শিকার হয়েছিল যে দেশটি, তার নাম আফগানিস্তান—আড়াই লাখ বর্গমাইলের এক পার্বত্য ভূখণ্ড। আমেরিকা স্লোগান তুলেছিল—‘হয় তুমি আমার পক্ষে, নাহয় তুমি সন্ত্রাসবাদী।’ পরের ২০টা বছর আমেরিকা আর তার দোসররা ছুটেছে তথাকথিত ‘ইসলামি সন্ত্রাস’ নামের এক ছুঁচোর পেছনে। পশ্চিমা মিডিয়া এই ছোটাছুটিরই নাম দিয়েছে ‘ওয়ার অন টেরর’।

২০ বছরে আফগান রাজধানী কাবুলের চেহারাও পালটে গেছে অনেকখানি। পুরোনো নগরী গায়ে-গতরে ঝকঝকে তকতকে হয়েছে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পা চেটে উত্থান ঘটেছে নব্য ধনিক শ্রেণির। শহরে জনসংখ্যার ঘনত্ব বেড়েছে। ৬ লাখ জনসংখ্যার পুরোনো কাবুলে এখন অর্ধকোটি মানুষের বসবাস। কাবুল যেমন পাশ্চাত্যের পরশে বদলে গেছে, তেমনি বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিকভাবে পরিপক্ব হয়েছে সম্প্রতি ক্ষমতায় ফেরা তালেবান। নতুন তালেবানের সামনে অগ্নিপরীক্ষা—আফগানিস্তান কি শান্ত হবে? জনগণ কি যুদ্ধ থেকে মুক্তি পাবে?

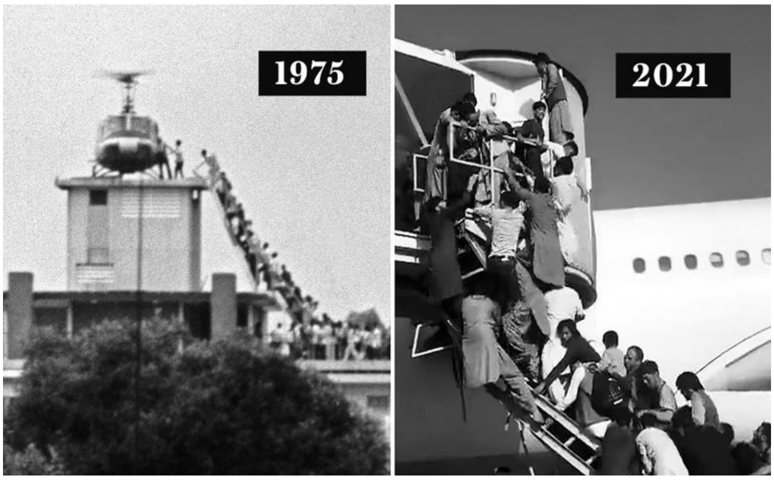

> পাশাপাশি দুটো ছবি। প্রথমটি তোলা হয়েছে ১৯৭৫ সালে, সায়গনে। আর দ্বিতীয়টির পটভূমি ২০২১ সালের কাবুল। ভিন্ন দুই শহর, ভিন্ন সময়, ভিন্ন প্রেক্ষাপট, কিন্তু বিদায়ের ধরনে কত মিল!

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমেরিকা যে কয়টি যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘমেয়াদি ছিল ভিয়েতনাম ও আফগান যুদ্ধ। তথাকথিত কমিউনিস্ট দুর্বৃত্তদের রুখতে আমেরিকা ভিয়েতনাম যুদ্ধে জড়ায় ১৯৬৫ সালে। কিন্তু গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা তো দূরের কথা, ১৯৭৩ সালে আমেরিকান সেনাদের ভিয়েতনাম রণাঙ্গন ছাড়তে হয়েছিল একেবারে শূন্য হাতে। তার দুবছর বাদেই তখনকার দক্ষিণ ভিয়েতনামের রাজধানী সায়গনের পতন হয়। আমেরিকান সমর্থনপুষ্ট সরকারের লোকজন যে যার মতো পালিয়ে বাঁচে। সেই পতনের সাথে ২০২১ সালের কাবুল পতনের মিল দেখছেন অনেকেই। ব্যবধান অবশ্য বেশি নয়, মাত্র ৪৬ বছর!

দুই দশকের ইঁদুর-বিড়াল খেলা শেষে আফগানিস্তান থেকে তাঁবু গোটাতে হয়েছে বিশ্ব পরাশক্তিকে। লজ্জাজনক এই বিদায়ের পর মার্কিন নেতৃত্ব বলছে— ভবিষ্যতে আর কোনো দেশ মেরামত করতে যুদ্ধে যাবে না আমেরিকা। জাতির উদ্দেশে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন—

> ‘বিদেশে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা পরিবর্তনের এটাই সময়। এ সিদ্ধান্ত শুধু আফগানিস্তান নিয়েই নয়; অন্য যেকোনো দেশ পুনর্গঠনে বড়ো পরিসরে সামরিক অভিযান চালানোর এটাই পরিসমাপ্তি!’

ভিয়েতনাম যুদ্ধের অর্ধশত বছর পরের তিক্ত এই অভিজ্ঞতায় মার্কিনিদের তেল চিটচেটে ভাব দূর হয়ে গেছে নিশ্চয়ই। আফগানিস্তানে সাম্রাজ্যবাদীদের তাড়া খাওয়ার যে ইতিহাস, আমেরিকা তারই ধারাবাহিকতা মাত্র। অতীতের দুই পরাশক্তি—ব্রিটেন আর সোভিয়েত ইউনিয়নের লজ্জাজনক পরিণতিই তারা বরণ করেছে। এখন আমেরিকার এ প্রস্থান গৌরবের, না অসম্মানের, নাকি কেবলই কৌশলগত পদক্ষেপ বা ভিন্ন কোনো ইতিহাসের সূচনা—সে আলোচনাকে অতটা গুরুত্ব না দিলেও চলে। কাবুল আমেরিকার দখলমুক্ত হয়েছে, আপাতত এটাই প্রশান্তি। তবে পশ্চিমের উদ্‌বিগ্ন চোখের দৃষ্টি এখনও কাবুলের দিকে—আবারও কি পুরোনো পথে হাঁটবে তালেবান?

তৈমুরের দরবারে বুলবুল-ই সিরাজ

‘কালো তিল কপোলে সেই সুন্দরী,
আপন হাতে ছুঁলে হৃদয় আমার,
বোখারা তো কোন ছার, সমরখন্দও
খুশি হয়ে তাকে দেবো উপহার।’

রক্ত ঝরানো যাদের নেশা, হায়েনার মতো ঝাঁপিয়ে পড়াই তাদের নীতি। মঙ্গোলদের কথাই ধরা যাক; ভর দুপুরের তেতে ওঠা রোদ, দৈত্যের মতো ধেয়ে আসা বালুঝড় কিংবা হিমাচল থেকে উড়ে আসা হু হু হাওয়ার স্পর্শ মাড়িয়ে তারা ছুটে গেছে আফ্রিকা-ইউরোপের প্রান্তে। ১২৬০ সালে মিশরের **মামলুকদের**[১] হাতে মার খাওয়ার আগ পর্যন্ত কোনো শক্তি মোঙ্গলদের সামনে দাঁড়াতে পারেনি। বলতে পারেনি—‘আমরা তোদের রুখে দিলাম!’

বিশাল চারণভূমি ডিঙিয়ে ক্ষিপ্র ঘোড়ার পিঠে চড়ে রুদ্ধশ্বাসে শত সহস্র কিলোমিটার পথ পাড়ি দেওয়া মোঙ্গলদের বলা যেতে পারে খুনে অভিযাত্রীর দল। শত্রুর রক্তের মধ্যেই এরা আজীবন খুঁজে গেছে নিজেদের টিকে থাকার শক্তি। কিন্তু রক্ত ঝরিয়ে ভূমির দখল নিলেই কী আর শাসক হওয়া যায়!

মঙ্গোলরা হায়েনার মতো ভিন্নজাতির লোকদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে, দখল করেছে একের পর এক জনপদ, বিস্তীর্ণ চারণভূমি। কিন্তু বিশাল ভূখণ্ডের মালিকানা তো আর শাসক হওয়ার শর্ত নয়। মঙ্গোলরা তাই না হতে পেরেছে শাসক, না ঘটাতে পেরেছে কোনো সাংস্কৃতিক বিপ্লব। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম মুঘলরা। ভারতবর্ষের মানুষের খাদ্যাভ্যাস আর লাইফস্টাইলই তারা বদলে দিয়েছে ৩০০ বছরের শাসনে।

মঙ্গোলদের সাথে মিল আছে মধ্য এশিয়ার ত্রাস তৈমুরের। বিদেশিদের কেউ তাকে বলে তাইমুর, কেউ-বা বলে তিমুরলেইন। মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিসের মতো তৈমুরেরও ছিল রক্ত আর সাম্রাজ্যের নেশা। তার অস্থির স্বভাব আর আগ্রাসী তলোয়ার কখনোই প্রতিবেশী শাসকদের থিতু হতে দেয়নি। এই যুদ্ধবাজ তৈমুরের রাজধানী ছিল সমরখন্দ। এটি বর্তমান উজবেকিস্তানের একটি শহর। মধ্য এশিয়া থেকে বের হয়ে আসা উন্মত্ত খুন তৈমুরের তলোয়ার রক্ত ঝরিয়েছে তুর্কমেন,

---

[১] মিশরের মামলুকরা সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী মামলুক শাসন কায়েম করেছিল। কিপচাক ও অন্যান্য অনেক তুর্কি জনগোষ্ঠী থেকে সংগৃহীত দাস সৈনিকদের মাধ্যমে এই শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। মামলুকরা সরাসরি সুলতানের তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণ নিতেন। সুলতান তাদের জন্য নীলনদের রাওজা দ্বীপে একটি সামরিক ঘাঁটি নির্মাণ করে দেন। এখানে মামলুকরা সামরিক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি ধর্মীয় ও আদর্শিক দীক্ষাও গ্রহণ করত। সময়ের সাথে সাথে তারা বিভিন্ন মুসলিম সমাজে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি প্রতিষ্ঠিত করে লেভান্ত, মেসোপটেমিয়া ও ভারতে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাগিয়ে নেয় সুলতানের পদ। ১২৬০ সালে আইন জালুতের যুদ্ধে মামলুক সালতানাত মোঙ্গল বাহিনীকে পরাজিত করে।

আরব, পারসিয়ান আর উসমানীয়দের। সেই তৈমুরের সাম্রাজ্যে বসেই প্রেয়সীর জন্য কবিতা লিখে ঝড় তুলে দিয়েছেন পারস্যের এক কবি—হাফিজ সিরাজি।

তাঁর পুরো নাম খাজা শামসুদ্দিন মুহাম্মাদ হাফিজ-ই-সিরাজি। পারসিয়ানরা এই সুফি কবিকে আদর করে ডাকে 'বুলবুল-ই-সিরাজ'। কবি সিরাজ মধ্য এশিয়ার ঐতিহাসিক নগরী বোখারাকে গণনাতেই রাখেননি। বোখারা তো বটেই, প্রিয়তমার গালের তিলের জন্য তিনি ছেড়ে দিতে চেয়েছেন তৈমুরের সমরখন্দকেও। হাফিজ তাঁর প্রিয়তমাকে তৈমুর সাম্রাজ্যের রাজধানী দিয়ে দেবেন, সম্রাট তা মানবেন কেন? সুতরাং, কবিকে তলব করা হলো তৈমুরের দরবারে। রাজদরবারে কী জবাব দিয়েছিলেন বুলবুল-ই সিরাজ?

> 'মহান সম্রাট! আসলে আপনি ভুল শুনেছেন। কবিতায় "সমরখন্দ ও বোখারা"র পরিবর্তে হবে "দো মণ কন্দ ও সি খোর্মারা"। আমি তো প্রিয়ার গালের তিলের বদলে দুই মণ চিনি আর তিন মণ খেজুর দিতে চেয়েছি মাত্র!'

হাফিজ কি আসলেই তৈমুরকে এমন উত্তর দিয়েছিলেন? কারও কারও মতে, হাফিজ এই কথা বলেননি, তৈমুরের সামনে এমন কথা বলার সাহস মূলত কেউ-ই রাখতেন না। রাজদরবারে ক্ষমা চেয়ে নেন হাফিজ। তৈমুর খুশি হয়ে মূল্যবান উপহার আর অর্থকড়ি দেন তাঁকে। পারস্যের আরেক কবি শেখ সাদিকে নিয়েও আছে এমন অনেক মুখরোচক গল্প। শেখ সাদি, উমর খৈয়াম আর ফেরদৌসীর মতো অনেক রত্নকে গর্ভে ধরেছে পারস্য। তার বুকে ডানা মেলে দাঁড়িয়ে আছে ইসফাহানের মতো নান্দনিক নগরী। ইসফাহান দেখলেই যেন পৃথিবীর অর্ধেক সৌন্দর্য দেখা হয়ে যায়। আর সেজন্যই তো বলা হয়—'শাহরে ইসফাহান, নেসফে জাহান।'

মুঘল সম্রাটদের মাতৃভূমি এই পারস্য। বাবর থেকে নাদির শাহ পর্যন্ত অনেক বিজেতা খাইবার পাস দিয়ে ভারতে এসে সাম্রাজ্য গড়েছেন। আবার কেউ কেউ এসে সম্পদ লুট করে ফিরে গেছেন নিজের দেশে। নাদির শাহ যাওয়ার সময় নিয়ে গেছেন ময়ূর সিংহাসন আর কোহিনুর হীরকখণ্ড। কিন্তু লুণ্ঠিত সম্পদ ভোগ করার ভাগ্য হয়নি তার। স্বদেশে ফেরার আগেই যাত্রাপথে খুন হয়েছেন আততায়ীর হাতে। সেই কোহিনুর এখন ব্রিটিশ রানির মাথায় শোভা পাচ্ছে। কিন্তু ময়ূর সিংহাসন কোথায়, সেই তথ্য আজও অজানা।

মুঘল সম্রাট আকবর তাঁর জিন্দেগির বড়ো একটা অংশ বিয়ে-শাদি করেই কাটিয়ে দিয়েছেন। হয়তো এটাই ছিল তার কাছে এক অ্যাডভেঞ্চার। এত বেশি পত্নী-উপপত্নীর বহর খোদ সম্রাটকেই বিভ্রাটে ফেলে দিত মাঝে মাঝে। সকালে ঘুম ভেঙে যে নারীকেই সামনে পেতেন, ভাবতেন—'আরে! এ তো আমারই স্ত্রী।' গিন্নির অভাব নেই আরবদেরও। প্রতিবেশী ইরানিদের মধ্যে তার ছিটেফোঁটা থাকবে না, তা কী করে হয়? পাহলভি পরিবারের আগে কাজার রাজবংশ ১৫০ বছর ধরে পারস্য শাসন করেছে। তাদের কাছেও বিয়ে-শাদি ছিল ডাল-ভাত। কাজাররা কেন এত বিয়ে করতেন? বই-পত্র সাক্ষ্য দিচ্ছে, সাম্রাজ্যের প্রয়োজনেই। কী সেই প্রয়োজনীয়তা?

ভারতবর্ষে ইংরেজদের লুটপাটের ইতিহাস

ইংরেজরা ভারতবর্ষ শাসন করেছে প্রায় ২০০ বছর। এই সময়ে তারা ভারতবর্ষ থেকে লুট করেছে প্রায় ৪৫ ট্রিলিয়ন ডলার সমমূল্যের সম্পদ। মাত্র কয়েক বছর আগের এক গবেষণায় উঠে এসেছে এই তথ্য। একবার ভাবুন তো, এই অঙ্কটা ঠিক কত বড়ো! এই লুট করা ডলারের অঙ্ক ব্রিটেনের এখনকার জিডিপি থেকে ১৫/১৬ গুণ বেশি!

ইংরেজরা নিজেদের ভারতবর্ষ উন্নয়নের রূপকার ভাবতে পছন্দ করে। তারা নাকি সাম্রাজ্য গড়ে বরং ভারতের উপকারই করেছে। ইংরেজরা ভারতবর্ষে রেল চালু করেছে, বড়ো বড়ো ব্রিজ গড়েছে, স্থাপনা তৈরি করেছে, প্রণয়ন করেছে নানাবিধ আইনকানুন। তাদের এই উন্নয়নের ফিরিস্তি শুনে আমরা অনেকে আবার হাততালিও দিই। ভারতবর্ষকে দেওয়া ছাড়া তাদের নাকি অর্থনৈতিক কোনো অর্জন নেই। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, তাহলে কি ইংরেজরা ভারতে এসেছিল নিজেদের সম্পদ বিলিয়ে দিতে? টানা ২০০ বছর ধরে এই মহান কাজটি করে গেল তারা?

কিন্তু এই ইংরেজ বদান্যতার গল্প যারা দিয়ে থাকেন, তাদের নাকেমুখে জল ঢেলে দিয়েছে একটি গবেষণা। এই গবেষণাপত্র বেরিয়েছে খোদ কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে—যেখানে দেখানো হয়েছে প্রায় ২০০ বছরের ভারতবর্ষ শাসনে ইংরেজ তথা ব্রিটিশরা এই অঞ্চল থেকে ৪৫ ট্রিলিয়ন ডলার মূল্যমানের সম্পদ নিয়ে গেছে। এটাকে বড়ো চুরিও বলতে পারেন, আবার লুটপাটও বলতে পারেন। গবেষক উৎস পাটনায়েক ১৭৬৫ সাল থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষের ট্যাক্স আর বাণিজ্য ডাটা থেকে বিশাল লুটপাটের এই অঙ্ক বের করেছেন। ইংরেজরা এই অর্থ-সম্পদ লুট করেছে অদ্ভুত এক ট্রেড পলিসি ব্যবহার করে। পূর্ণ কলোনি গড়ার আগে তারা ভারতীয়দের কাছ থেকে চাল আর টেক্সটাইলসসামগ্রী কিনত রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে। সে সময় সব দেশের সাথে রুপার মাধ্যমেই বাণিজ্য করত তারা। কিন্তু ১৭৫৭ সালের পলাশী যুদ্ধের পর ভারতবর্ষ চলে যায় ইংরেজদের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে। বক্সারের যুদ্ধে মির কাসিমের পরাজয়ের পর আরও পোক্ত হয় ব্রিটিশ আধিপত্য। ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ বাণিজ্য তখন তাদের করতলে। সরাসরি রাজস্ব আদায় শুরু করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। আদায় করা অর্থের এক-তৃতীয়াংশ তারা ব্যয় করে নিজেদের ব্যবহার্য ভারতীয় পণ্য কেনার কাজে। এর অর্থ হলো—ভারতীয় পণ্য কিনতে নিজের পকেট থেকে টাকা দেওয়া লাগছে না। মানে ব্রিটিশরা ভারতীয় পণ্য পেত কোনো রকম মূল্য না চুকিয়েই। আর এই টাকাটা মূলত যেত ভারতের কৃষক আর তাঁতিদের পকেট থেকে। কিন্তু অসচেতন ভারতীয়রা এই চুরি ধরতেই পারেনি। ধরবেই-বা কী করে; ইংরেজরা ট্যাক্স আদায় করতে যাদের পাঠাত, তাদের আবার ভারতীয় পণ্য কেনায় পাঠাত না। দুটি দল একই হলে হয়তো কিছুটা আঁচ পাওয়া যেত। কিন্তু ধুরন্ধর ইংরেজরা ছিল খুব সতর্ক।

চীন, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও মাও সে তুং

গত শতকের মধ্যভাগে এক নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় প্রবেশ করেছিল চীন। রুশদের আদলে দেশটিতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হয়। রাশিয়ায় শ্রমিকরা বিপ্লবের মূল জোগানদার হলেও চীনে এই বিপ্লবের পেছনে ছিল কৃষকরা। মাও সে তুং-এর হাত ধরেই চীন প্রবেশ করে সমাজতান্ত্রিক ধারায়। চীনা কমিউনিজমের আধ্যাত্মিক গুরু মাও-কে অনেকেই আধুনিক চীনের প্রতিষ্ঠাতা ভাবতে পছন্দ করেন। ভুলটা এখানেই। আজকের যে শক্তিশালী ও অত্যাধুনিক চীন, তার কৃতিত্ব মাও-কে দেওয়া অন্যায় হবে; বরং এর কৃতিত্বের প্রকৃত হকদার মাওয়ের উত্তরসূরি সংস্কারপন্থি কমিউনিস্ট নেতা দেং জিয়াও পিং।

মাও-এর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত অন্য কেউ চীনা কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান হতে পারেননি। তার দর্শন 'মাওবাদ' রক্তাক্ত করেছে দক্ষিণ এশিয়ার ভারত, নেপাল এমনকি শ্রীলংকার মতো দেশকেও। ১৯৪৯ সালে কীভাবে বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন মাও?

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ৩৭ বছর আগে আরও একটি বিপ্লব দেখেছিল চীন। সেই বিপ্লবকে বলা হয় ঝিনহাই বিপ্লব বা চীন বিপ্লব; যার মধ্য দিয়ে উৎখাত হয়েছিল মাঞ্চু সাম্রাজ্য। গণবিক্ষোভের মুখে চীনের নাবালক সম্রাট পুয়ি ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়ান। আড়াই শতকেরও বেশি সময় পর চীনে ক্ষমতা ফিরে পায় **হান জাতির**[২] লোকরা। ঝিনহাই বিপ্লবের মধ্য দিয়ে চীনকে রিপাবলিক ঘোষণা করা হয়। আর তার অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট করা হয় ডাক্তার সান ইয়াৎ সেনকে। রাজতন্ত্র উৎখাত করে গণপ্রজাতন্ত্রী চীন প্রতিষ্ঠার মূল কারিগর তিনিই।

কিন্তু সান ইয়াৎ এই পদে বেশিদিন থাকতে পারেননি। যার সাথে সমঝোতা করে তিনি অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন, সেই ক্ষমতালিপ্সু কমান্ডার ইউয়ান সিকাই-এর হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে হয়। কমান্ডার সিকাই চীনকে আবারও রাজতন্ত্রে ফেরাতে চাইলেন, সম্রাট ঘোষণা করলেন নিজেকে। সম্রাট ঘোষণার বছরখানেক বাদেই মারা যান সিকাই। এদিকে, সান ইয়াৎ সেন সমর্থিত গ্রুপটি বেরিয়ে এসে অন্যান্য ছোটো দলগুলোকে সাথে নিয়ে গঠন করে নতুন জাতীয়তাবাদী দল 'কুওমিনটাঙ'। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এই দলটির নেতৃত্ব দেন সান ইয়াৎ। তারপর তার উত্তরসূরি করা হয় চিয়াং কাইশেককে। দলীয় প্রধানের পাশাপাশি কাইশেক একসময় গণতান্ত্রিক চীনের প্রেসিডেন্টও বনে যান।

---

[২] চীনে ৫৬টি জাতির মধ্যে হান জাতির লোকসংখ্যা সবচাইতে বেশি। পৃথিবীতে হান জাতিই সর্বাধিক লোকসংখ্যার জাতি। মূল চীনের শতকরা ৯২ ভাগ মানুষ নৃতাত্ত্বিক হান জাতিভুক্ত। সংখ্যায় এরা ১২০ কোটি। বেশিরভাগ মানুষ এই হানদেরই চৈনিক বলে উল্লেখ করে থাকে। হান জাতির সভ্যতার ইতিহাস পাঁচ হাজার বছরের পুরোনো। চীনের শ্রমবাজার বলতে গেলে পুরোটাই হান জাতি-গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে সংকুচিত করে রাখা হয়েছে। বলা যেতে পারে, দেশটির অর্থনীতি ও উন্নয়ন অনেকাংশেই নির্ধারিত হয়েছে এই জাতিগোষ্ঠীর মাধ্যমে।

যেভাবে পরাশক্তি হলো চীন

চীন এখন 'পঞ্চম ড্রাগন'। একবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই স্বস্তির যাত্রা শুরু করেছে দেশটি। এর মধ্যে তার নীতিতে, বিধিতে আর আচরণে এসেছে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। এক সন্তান, দুই সন্তান নীতি থেকে বেরিয়ে সবশেষে গ্রহণ করেছে তিন সন্তান নীতি। সংস্কারের ডানায় ভার তুলে দিয়ে চীন আপাতত সফল। কিন্তু গত কয়েক দশকের এই সংস্কারের ধারা কতটা সমাজতান্ত্রিক ছিল, সে প্রশ্ন তোলা যেতেই পারে। অস্বীকার করার উপায় নেই, সেখানে সংস্কার যতটা ভারী হচ্ছে, ততটাই হালকা হচ্ছে সমাজতন্ত্র। তবে সমাজতন্ত্রের মুখোশ টিকে থাকায় স্বৈরতন্ত্র বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে সহজে।

সমাজতন্ত্রের চিরাচরিত ফর্মুলা ডিঙিয়ে চীন কেন অর্থনৈতিক সংস্কারে মন দিয়েছিল তার একাধিক ব্যাখ্যা রয়েছে। প্রথমত, দেশটির অর্থনীতিতে যে স্থবিরতা এসেছিল, তা কাটিয়ে ওঠা জরুরি ছিল। সেইসাথে বিশ্ব অর্থনীতিতে দাদাগিরি ফলানোর জন্য যে প্রক্সি লড়াই চলছিল, সেখানে অংশগ্রহণ করাকে অনিবার্য মনে করেছিল চীন। সমাজতান্ত্রিক নীতি-কাঠামো ঠিক রেখে এই লড়াইয়ে সুফল পাওয়ার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না প্রায়। ফলে নীতির প্রশ্নে আপস করতে হয়েছে তাকে। তবে সরকার টিকে থাকার প্রধান ব্যাপারটি নিহিত রয়েছে জনগণের খুশি-অখুশিতে। তাই চীনা জনগণের জীবনমান উন্নয়নেও সরকারের লক্ষ্য ছিল স্থির।

সংস্কার করতে গিয়ে অর্থনীতির ওপর কমিউনিস্ট সরকারের নিয়ন্ত্রণ কমাতে হয়েছিল, সৃষ্টি করতে হয়েছিল ব্যক্তিগত খাত। এমনকি দূর করতে হয়েছিল বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগের সকল প্রকার বাধা। প্রথম কোনো চীনা শীর্ষ কমিউনিস্ট নেতা হিসেবে আমেরিকা সফরে গিয়েছিলেন দেং জিয়াও। এরপরই চীনে বিনিয়োগ শুরু করে আমেরিকা। সমাজতান্ত্রিক চেতনা এখানেই মার খেয়ে যায়। আর কাগজে-কলমে সমাজতান্ত্রিক হলেও পুঁজিবাদের ব্যামোতে ধীরে ধীরে আক্রান্ত হতে থাকে চীন।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরবর্তী দুই দশক চীনের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রা মোটেও আশানুরূপ ছিল না। মাও-এর 'গ্রেট লিপ ফরোয়ার্ড' চীনের গ্রামাঞ্চলে গরিবের সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়েছিল। কৃষক তার উৎপাদিত পণ্য থেকে কোনো কিছু সঞ্চয় করতে পারছিল না। ছিল না বিদেশি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা। অবকাঠামোগত উন্নয়নেও নজর ছিল না কারও। সমাজতন্ত্রের নামে এই বাড়ন্ত দারিদ্র্যকে তাই সংস্কারের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা জরুরি হয়ে পড়েছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, জার্মানি ও তার ট্র্যাজেডি

জার্মানির অদম্য যাত্রা মলিন করে দেয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। ব্লু ব্লাডের দীর্ঘ রাজতন্ত্রের সিলসিলা শেষ পর্যন্ত টিকিয়ে রাখা যায়নি। জার্মান মিত্র উসমানীয়দের ভাগ্যেও জুটেছিল একই পরিণতি। যুদ্ধের পর সালতানাত ভেঙে গিয়ে কেবল আনাতোলিয়াকে ঘিরে জন্ম নেয় তুর্কি রাষ্ট্র। যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি আর বিজয়ীদের চাপে জার্মান অর্থনীতি একরকম ধসে যায়, বেড়ে যায় রাষ্ট্রীয় ঋণ। রিকস ব্যাংক নোট ছাপিয়ে রাষ্ট্রের অর্থের ঘাটতি কমানোর উদ্যোগ নেয়। ফলে ১৯২০-এর দশকে উৎপাদনের তুলনায় জার্মানিতে মুদ্রার সরবরাহ বেড়ে যায়। পরিণতি যা হওয়ার কথা তা-ই হয়, সমগ্র জার্মানিতে দেখা দেয় ভয়াবহ মুদ্রাস্ফীতি। অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, এটাকে বলা যেতে পারে ছোটোখাটো একটা ‘ইকোনমিক সুইসাইড’। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এই মুদ্রাস্ফীতি টেনে নিয়ে গেল ১৫০ শতাংশ পর্যন্ত। নিউইয়র্কের জেপি মরগ্যান অ্যান্ড কোম্পানি মিত্রপক্ষের হয়ে যুদ্ধব্যয়ের একটা অংশ বহন করেছিল, কিন্তু জার্মানির বেলায় কেউ এগিয়ে আসেনি। তার ওপর জার্মানির গুরুত্বপূর্ণ সম্পদগুলা হাতিয়ে নিয়েছিল বিজয়ী দেশগুলো। বিশেষ করে টাঙ্গানিকা আর দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা কুক্ষিগত করে ব্রিটেন। বাগদাদ রেলপ্রজেক্টের মাধ্যমে যে মার্কেট শুরু হয়েছিল, হাতছাড়া হয় সেটাও। **ভার্সাই চুক্তির**[৩] ফলে জার্মানির লৌহ আকরিকের ৭৫ শতাংশ খোয়া যায়। একইভাবে জিংক আকরিকের ৬৮ শতাংশ আর কয়লার ২৬ শতাংশ দখল হারায় পরাজিত জার্মানি। তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকা এক-পঞ্চমাংশ ট্রান্সপোর্ট ফ্লিট, এক-চতুর্থাংশ ফিশিং ফ্লিট, দেড় লাখ রেলরোড কার, পাঁচ হাজার মোটর ট্রাক বাগিয়ে নেওয়া হয় ক্ষতিপূরণ হিসেবে। এতেই শেষ নয়, সর্বমোট ১৩২ বিলিয়ন গোল্ডমার্ক (৬৬০ কোটি পাউন্ড) ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হয়—যা ছিল তৎকালীন জার্মানির সামর্থ্যের তিনগুণ বেশি।

---

[৩] প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরপর বিজয়ী মিত্রশক্তি এবং জার্মানির মধ্যে ১৯১৯ সালের ২৮ জুন ভার্সাই চুক্তি সম্পাদিত হয়। পরের বছর ১০ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হয় সেটি। ফ্রান্সের ভার্সাই রাজপ্রাসাদে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিটির খসড়া হয়েছিল ১৯১৯ সালে অনুষ্ঠিত প্যারিস শান্তি সম্মেলনে। খসড়ার মূল নকশা করেন ব্রিটেনের ডেভিড লয়েড জর্জ, ফ্রান্সের জর্জেস ক্ল্যামেনশো, যুক্তরাষ্ট্রের উড্রো উইলসন এবং ইতালির ভিটোরিও অরল্যান্ডো। এ চুক্তির মাধ্যমে প্রশান্ত মহাসাগর এবং আফ্রিকার সবগুলো জার্মান কলোনি ব্রিটেন, ফ্রান্স ও অন্যান্য মিত্রশক্তির কুক্ষিগত হয়। শতকরা দশভাগ কমিয়ে আনা হয় জার্মানির রাষ্ট্রসীমা এবং জনসংখ্যা। জার্মানিকে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় এবং মিত্রশক্তির অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহে সংঘটিত সব ধরনের ক্ষয়ক্ষতির জন্য এককভাবে দায়ী করা হয় জার্মানদের।